



## Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 187 - 195

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

# আশাপূর্ণা দেবীর অণুগল্লে নারী চরিত্রের বর্ণনা

কোহিনূর খাতুন

সহকারী অধ্যাপিকা, সমাজতত্ত্ব বিভাগ

নাথানিয়াল মুর্শু মেমোরিয়াল কলেজ, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

Email ID: [khatunkohinur452@gmail.com](mailto:khatunkohinur452@gmail.com)

 0009-0007-0718-5625

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

### Keyword

Women,  
Mother,  
Infertile women,  
Patriarchy,  
Dominant  
discourse,  
Gender politics,  
Bengali short  
story.

### Abstract

Half of the human population consists of women. Women's identity, character formation, and patterns of life are continuously shaped by social institutions such as literature, culture, values, norms, customs, and traditions. Therefore, challenging the assumption that being a wife automatically defines a woman, Simone de Beauvoir argues that "one must participate in a mysterious and precarious reality called femininity in order to become a woman." Femininity thus emerges as a socially constructed and empirically validated category. Throughout her life, a woman is required to become a woman, remain a woman, and repeatedly perform womanhood. This is a historical and social process that has been reproduced across centuries. Within society, women's experiences of being a daughter, a spouse, a mother, a childless woman, or a divorced woman generate a dominant discourse within the structural confines of patriarchy. These life stages function as social roles that define women's social identity and position. Society's perception of women, as well as women's internalized perception of society, collectively shape women's lifestyle and everyday practices. The primary objective of this paper is to examine the position of women within the family structure of the Bengali middle-class through an analysis of Ashapura Devi's unpublished short stories. The study also aims to identify the directions of possibility toward the transformation and advancement of women's position as indicated in Ashapura Devi's writings.

### Discussion

পুরুষকেন্দ্রিক বিশ্বদৃষ্টির দ্বারা গঠিত নারীর চরিত্রের গড়ন বর্ণনায় সাহিত্য রচনার ভূমিকা অনবদ্য। নারী কি? Arther Schopenhaur (1788-1860) বিখ্যাত গ্রন্থ 'On Women' এ বলছেন নারী হল গর্ভ (Tota muiler in utero)। নারী শব্দের আক্ষরিক অর্থে গ্রথিত রয়েছে ইহা পুরুষের সংযোজন, অর্থাৎ মানবী বা মানুষীরাপিণী। যা সংস্কৃত মূল ধাতু 'ন্' অর্থাৎ 'পুরুষ' থেকে গৃহিত। ইংরাজিতে 'Woman' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'Wife of man'। মনুষ্য জাতির অর্ধাংশ নারীর পরিচয়, চরিত্রগঠন এবং জীবনশৈলীর নির্ধারক হিসেবে কাজ করে চলেছে সাহিত্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, রীতিনীতি,

প্রথার মত এমন অনেক সামাজিক উপাদান। কাজেই স্ত্রী মানেই যে নারী এই ভাবনায় সিমন দ্য বোভয়ার বলেন যে, “নারী হবার জন্য তাকে রহস্যময় ও বিপন্ন বাস্তবতায় অংশ নিতে হবে যার নাম নারীত্ব”। নারীর নারীত্ব হয়ে ওঠে প্রমাণ নির্ভর। সারা জীবন তাকে নারী হতে, নারী হয়ে থাকতে এবং নারী হয়ে উঠতে হয়। এ এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যার শতাব্দী থেকে শতাব্দী ধরে পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। সমাজে নারীর মেয়ে হবার, দম্পতি হবার, মা হবার, সন্তানহীনা নারী হবার বা বিবাহবিচ্ছেদ প্রাপ্ত নারী হবার যে অভিজ্ঞতা তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ঘেরাটোপে একটি প্রাধান্যকারি বয়ান তৈরি করে। নারীর জীবনের এই দশাগুলি নারীর জীবনকে সংজ্ঞায়িত করে। তার প্রতি সমাজের ভাবনা, সমাজের প্রতি তার ভাবনা নারীর জীবন শৈলীকে আকার দেয়। এ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং তাঁর সাংসারিক জীবন সবটাই সমাজের রক্ষণশীল বাতাবরণের মধ্যে হওয়া ফলে, তাঁর অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার স্তরে স্তরে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় মধ্যবিত্ত পুরুষতান্ত্রিকতার ছাপ। শিল্পীমনা আশাপূর্ণা জ্ঞানবিকাশের মুহূর্ত থেকেই সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর রচনার উপকরণ খুঁজে মণিমুক্তের সম্ভারে নিজের লেখনী সমুহে প্রানের সঞ্চয় করেন। তাঁর অগুণ্ণের উদ্দেশ্য হল লক্ষ্যভেদী চিন্তা ভাবনার প্রকাশ। তিনি অল্প কথায় অনন্য উন্মোচন, এবং অনুভূতি ও ভাবের উপস্থাপন করেছেন। এই উপস্থাপনের সুকৌশলে রয়েছে উপস্থাপনার আড়ালে অ-উপস্থাপনীয় ধারণা। যা উঠে এসেছে নারীর জীবনের খণ্ড প্রতিকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে, উঠে আসা ও লিখিতের ছায়াপথে নিহিত অর্থের রহস্য উন্মোচন করেন তিনি। নারীর জীবনে নারীত্ব হল দেশ-কাল ও পাত্র নির্বিশেষে সমাজপ্রদত্ত প্রত্যাশা। নারীকে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতায় বেঁধে ফেলার অন্তহীন প্রয়াস। এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হল আশাপূর্ণা দেবীর অগ্রস্থিত অনুগল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ প্রতিরূপী পরিবারে নারীর অবস্থান আলোচনা করা। লেখিকার লেখায় অসংখ্য মূল্যবান আলোচনায় পাঠক সমাজ বিগলিত। তবে এই লেখায় মূলত নারী, নারীর জীবন, নারীর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে। লেখিকার অনুগল্পে নাটকীয় ভঙ্গিমায় চরিত্রকে সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীর জীবনের পটভূমি রচনা এবং তার স্বরূপ উদ্ঘাটন, নারী বলেই নারীর জীবনের এমন নিটোল নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। আশাপূর্ণা দেবীর অগুণ্ণে নারী চরিত্রের বর্ণন, তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি, বিশ্লেষণ শক্তি ও পর্যবেক্ষণ তার নিপুণতা দর্শায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর অদম্য অনুসন্ধিৎসুতা অপরিহার্য। অগুণ্ণের প্রেক্ষাপটে নারীর জীবনী অভিজ্ঞতার রচনা এবং স্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ সাহিত্যের সবচেয়ে ক্ষুদ্ররূপে ব্যপক ছাপ রেখে যায়। তার ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে এক আকর বিশেষ। সামাজিক জীবন যাত্রার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রাণবন্ত প্রস্ফুটন দেখা যায়। গল্প চরিত্রগুলি যেন লেখিকার অভিজ্ঞতাকে যথাযথ বর্ণনা করে, এবং চরিত্রগুলির মাধ্যমে যে লেখিকা যেন ফিরে ফিরে দেখছেন তাঁর যাপন। তাঁর জীবনাদর্শনের ছাপ পাওয়া যায় লেখনীতে।

পরিবারে চার দেওয়ালের মধ্যে নারীর রাগ অনুরাগ, স্নেহ-মমতা, বিচিত্র অনুভূতি তার অনুগল্পের অনুশঙ্গে খোলস মুক্ত হয়েছে। সমাজ স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের অধীনতা-বশ্যতার জটিল সম্পর্কের গভীর আলোচনা করা হয়েছে, সমাজে সন্তানহীনা নারীর এবং বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া নারীর জীবনের পরিণতি কি আসলে এটাই হয়, নাকি এর থেকে বেরিয়ে পাঠক ভাবতে বাধ্য হবে। কেট মিলেট বলেন যেটাকে আমরা পরিবারের ভেতরের বলে মনে করি, এককথায় অন্দরমহলের ঘটনা বলে মনে করি সেখানে ও যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সূক্ষ্ম ক্ষমতার প্রতাপ, স্বার্থপরতা ও বঞ্চনার একটা রাজনীতির উপস্থিতি থাকে। সে পরিবারের যেকোনো সম্পর্কে হতে পারে। যেখানে এই রাজনীতি একধরনের ক্ষমতার আফালনের বহিঃপ্রকাশ করে।

‘আসল বেনারসি ল্যাংড়া’ গল্পে কর্তা প্রসন্নজীবন রায়ের স্ত্রী সীমা, তার স্বামীর প্রতি নির্ভরশীলতা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে স্বামী ছাড়া সে অচল। আশাপূর্ণা দেবীর অনুগল্পের সীমা হল এমন এক নারী যে তার স্বামীর মৃত্যুর কল্পনার সাথে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবার আশঙ্কায় মর্মান্বিত হয়ে পরছে। গৃহ কত্রী, কর্তা প্রসন্নজীবন রায়ের অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে রাত হচ্ছে দেখে একেবারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সে কোন ভাবেই পড়ে থাকা সেলাই নিয়ে বসতে পারছে না। তার মনে নানা কুচিন্তা বাসা বাঁধছে। তার ক্ষুদ্র বিরক্ত হওয়ায় মেয়ে খুকু ও ছেলে পিন্টু ওরফে পল্লব নির্দিধায় মাকে বলতে

পারে যে “দুশ্চিন্তা করাটাই তো মা’র পেশা”। একেবারে ঘরোয়া নারী সীমার কাছে তার স্বামী এই সময়ে সবচেয়ে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে, তার স্বামীর প্রতি তার নির্ভরশীলতা প্রমাণ দেয় যে স্বামী ছাড়া তার জীবন শেষ।

দরজায় ধাক্কা দিলে সীমা স্থলিত স্বরে বলে ওঠে, -

“বুঝেছি! সর্বনাশ হয়ে গেছে, পুলিশের লোক খবর দিতে এসেছে! পিন্টু-,”

তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল নানান দৃশ্য, যেন তার স্বামীর ক্ষত বিক্ষত, রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছিল পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, নার্স, হাসপাতালের খাট, মাথায় ব্যান্ডেজ, নাকে অক্সিজেনের নল, মর্গ, খাটিয়া সাদা চাদর মোড়া শরীর, অগুরু চন্দন, ফুলের মালা, চিতার আগুন, থান, হবিষ্যি, শ্রাদ্ধসভা, মুণ্ডিতমস্তক পুত্র।

নারীর জীবনধারণের একমাত্র উপায় হয় স্বামীর উপার্জন, যা ব্যতিত তার জীবনে দুর্ভোগের শেষ নাই, আমাদের সমাজ প্রসূত এই ভাবনায় নারীর কর্মক্ষমতা ঘরের কাজের মধ্যেই সীমায়িত করে রাখে, কারণ তার মধ্যে নাকি যুক্তিবাদীতার অভাব আছে, সে আবেগপূর্ণ। জনপরিসরের কাজ একমাত্র পুরুষ এরই জন্য। নারীর ব্যক্তিত্ব হয় ভঙ্গুর, ভয়সংকুল। এখানে ভালবাসার সাথে নির্ভরশীলতার মিশ্রসমীকরণ দেখা যায়। -

“এসব চিন্তা তো ইচ্ছাকৃতও নয়, চেষ্টাকৃতও নয়, চোখের সামনে এসে যাচ্ছিল, ভেসে যাচ্ছিল, নাচানাচি করছিল। নেচে নেচে সীমা নামের প্রেমের প্রতিমাকে কাবু করে দিচ্ছিল, শিথিল করে দিচ্ছিল তার হাত-পা, সেই শিথিল স্নায়ুর উপর পড়ল এই হাতুড়ির ঘা।”<sup>২</sup>

কাজ থেকে ফিরে আসা ক্ষুরক্ষুর গৃহকর্তা সীমাকে সারাদিন কাজে যাওয়ার খোঁটা দিতে শুরু করে, ট্রেনে বাসের ভিড় ঠেলে অফিসে যাওয়া-আসা করা -

“...মুরোদ থাকে তো একদিন গিয়ে দেখে এসো না? ঘরের মধ্যে আরামে আয়েসে বসে দুটো ভাতসেদ্ধ করতেই তো ক্ষয়ে যাচ্ছ! বুঝতে ঠেলা, যদি আমার মতন,”<sup>৩</sup>

সীমার বিলাপে স্থান পায় -

“একটু থেমে, একটু হাঁপিয়ে, একটু কেসে আবার শুরু করে, ‘রাতদিন বাজার থেকে মাল উধাও হয়ে যাচ্ছে। আজ তেল উধাও, কাল দালদা উধাও, পরশু কেরোসিন উধাও, তরসু রেশনের গম চাল চিনি উধাও, নিত্যি দুধের গাড়ি আসছে না, - খালি বোতল নিয়ে ফিরছে, দস-বিশ ঘণ্টা লোডশেডিং, পাম্প চলে না, হিটার জ্বলে না, আটা ভাঙানোর চাকী বন্ধ, ফ্রিজের দফা গয়া, কে ম্যানেজ করছে এসব?’”<sup>৪</sup>

এই গল্পে সংসারে ছেলে মেয়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও বাবা-মায়ের মতভেদ লক্ষ্যনীয়। সর্বশেষে গল্পের বাচনিক পটুতা এবং একটা সুচাতুরিক দাড়ী দিয়ে নারী পুরুষের সম্পর্কে যে অধীনতা-বশ্যতার সম্পর্কেও স্বাভাবিক করে তুলেছে। কর্তা এত দুর্গতি করে আসার সময় ল্যাংড়া আম বয়ে এনেছে। -

“এতটি রাস্তা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এসেছি- বলি আমি ব্যাটা ভিড়ে আখমাড়াই হই-হই, তোদের মা’র আমগুলো না টস্কায়!”<sup>৫</sup>

প্রসন্ন জীবন দেবী করে বাড়ি ফেরা এবং এত অসুবিধের মধ্যে যত্ন সহকারে আম নিয়ে আসা, একদিকে স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসার নিদর্শন রাখে আবার অপরদিকে, তার বাড়ি ঢোকানোর সাথে সাথে সে নিজের আচরণ দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার উপস্থাপনা করেছে। তাদের নিজের পছন্দে বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের প্রতি অধীনতা-বশ্যতার সম্পর্ক প্রমাণ পেয়েছে। পারিবারিক জীবনের ঘাত-সংঘাত সূক্ষ্ম অনুভবের তীব্রতায় নারীর জীবন গঠিত হবার সাম্প্রিক প্রমাণ করেছে।

এরকমই আলোচনার সাম্প্রিক প্রমাণ করে ‘সবদিক বজায়’ গল্পে জয়তী। স্বামী অরুণ, স্ত্রী জয়তী এবং তাদের সতেরো বছরের একমাত্র মেয়ে খুকুকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। হঠাৎ টেলিগ্রাম এসেছে অরুণের মা অর্থাৎ জয়তীর শাশুড়ি মায়ের অসুস্থতার, তাতে দু-ঘণ্টার নোটিশে তাদের সব গুছিয়ে রেখে জঙ্গিপুুরের উদ্দেশ্যে বেরোতে হবে। জয়তী দিশেহারা, কারণ শাশুড়ি যদি মারা যান তাহলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরার কোন অবকাশ থাকছে না, আর যদি তা না ও হয়, অরুণ তাকে কিছুদিনের জন্য তাকে ওখানে রেখে আসবে, যা তার কাছে বিদ্যুটে জায়গা বলে মনে হয়। আর ঠিক এই সময়েই দু-তিনটে বিয়ে বাড়ি পড়েছে যার প্রস্তুতি সাপেক্ষে জয়তী ভল্ট থেকে গয়না তুলে নিয়ে এসে বাড়ীতে রেখেছে। যাওয়ার

আগে সেগুলি মেজদির বাড়ীতে রেখে আসার পরিকল্পনা করে জয়তী, মেয়ে অসহায় মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে -

“সামনের মাসেই যে আমার টেস্ট, সেটা বোধহয় মনে রাখার দরকার নেই?”<sup>৬</sup>

খুকু জঙ্গিপুর ঠাকুমাকে দেখতে যেতে নারাজ। তবে সে যে যাচ্ছে না তা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে তার মায়ের সামনে কথা রাখছে, যেটা হয়তো জয়তী তার জীবদ্দশায় কখন করেছে বলে তার স্মরণ হচ্ছে না।

“ঢিলে ঢিলে বেল্‌বটম আর টান টান পাঞ্জাবি পরা খুকু অভ্যাসগত ভাবে দুহাত দিয়ে ঘসে ঘসে পাঞ্জাবীটাকে পালিশ করার মতো করে চোস্ত করতে করতে অনায়াস ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে উল্টে বলল, ‘হবে’ বললেই অমনি হবে, বই নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও বসে পড়া? হুঃ! আমার দ্বারা হয় না। আমার পক্ষে এখন যাওয়া ইম পসিবল! অসম্ভব!”<sup>৭</sup>

মা জয়তী মাতৃহের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে, মেয়ের সমস্ত সাধ আহ্লাদ, ইচ্ছে, পছন্দ, খুকুর ভালো লাগা মন্দ লাগার বশেই মায়ের জীবন নিয়ন্ত্রিত। সে দাসী তার মনিবের মেয়েকে মানুষ করেছে, তার আর অরণের কত মধুর মুহূর্ত সে ধ্বংস করেছে। যে মেয়ের জন্মের পর থেকে তার প্রতিনিয়ত খেয়াল রেখে চলেছে, তার জীবনের সুখ, শান্তি চাওয়া পাওয়া সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে। সেই মেয়ে তার আজ তার সাথে এই ব্যবহার করছে।

“যে মেয়ের দেহের কান্তি পুষ্টি বৃদ্ধি কল্পে জয়তী, চিরদিন প্রাণপাত করে চলেছে এখন সেই মেয়েরই বাড়ন্ত পুরন্ত শরীরের উদ্ধত বুক আর উদ্ধত মুখের দিকে তাকিয়ে জয়তী র মাথা থেকে পা অবধি যেন বিষ ছড়িয়ে গেল। আর ওই ব্যঙ্গহাসিতে বাঁকা ঠোঁট আর টোল পড়া গালটি? ওরা যেন জয়তীর হাতটাকে নিসপিস করাতে থাকে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেবার জন্য। প্রচণ্ড চড়।”<sup>৮</sup>

জয়তী যেভাবে আদরে যত্নে মেয়েকে মানুষ করেছে যে তাকে শাসন করতে হলে তাকে বারাবার ভাবতে হচ্ছে। লেখিকা এখানে জয়তীর চরিত্রের উত্তরণের আশায় তার মেয়ে খুকুর বেড়ে ওঠার বর্ণনায় যেন কোথাও দিক নির্দেশ করছেন, যেন জয়তির সাথে তার মেয়ে খুকুর বেড়ে ওঠায় কোন মিল নেই। কাজেই খুকু নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারবে, সে আত্ম বিশ্বাসে পরিপূর্ণ, দৃঢ়চেতা, যে বাবাকেও ভয় পায় না। বিপরীতে সে মাকে উপদেশ দিচ্ছে যে এখন নাকি তার মা অর্থাৎ জয়তীর পরিষ্কা, তার উচিত গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে শাশুড়ি মায়ের সেবা করা, তাতে তার মা ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হয়ে যাবে। একদিকে নারী চরিত্রে জয়তী তার সন্তানের দায়িত্ববোধ হীনতাকে চাকতে তার স্বামীর আদেশ অনুসরণ করতে মরিয়া, সে মেয়ের এই অস্বাভাবিক আচরণের সামাল দিতে যেন নিজের সাথে নিজেই লড়াই করে চলেছে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতির সামাল দিতে মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কারণ সে তার সতেরো বছর বয়সী মেয়ের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, আবার পরিবারের লোকজনের কথা চিন্তা করে, যে শাশুড়ির অসুস্থতায় যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছানোর চেষ্টা করছে তা না হলে পরিবারের লোকজন কি বলবে। এখানে জয়তীর অসহায়তা আর খুকুর সুদৃঢ় ঘোষণায় মেয়ে ও মায়ের সম্পর্কে অধীনতা - বশ্যতার সম্পর্ক স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। খুকু যে তার মাকে পরামর্শ দেয় পরিবার তথা দেশের বাড়ীতে তার মাণ রক্ষার জন্য তার যাওয়া উচিত। অন্যদিকে খুকু যে কিনা ঠাকুমার শারীরিক পতনের খবর পেয়ে ও নির্ধিকায় তার বাস্তুবী রাখীর জন্মদিনের নেমস্তল্লে চলে গেল। জয়তী অনুভব করে যে খুকুর জন্য সে মুনিমনোলোভা সাজের পোশাক আসাক আর বিদেশী সেন্ট সে কিনে দিয়েছিল শখ করে, এখন কেন সেই টাইট ফিট পোশাক পরা শরীরটার উদ্ধত ভঙ্গি দেখে তার রাগ হচ্ছে? সাজটা তার কাছে কুশ্রী লাগছে কেন? এই সাজটাই কি খুকুকে এমন বেপরোয়া হবার, বিশ্ব নস্যৎ করার শক্তি যোগাচ্ছে? আসলে সমাজ প্রত্যাশিত আচরণগুলি জয়তী এমন কি খুকুর চরিত্রে ভীষণ ভাবে গ্রথিত কাজেই, সেই প্রত্যাশায় যখনই ব্যতিক্রম ভাবনার আবিষ্কার হচ্ছে তাদের অবচেতন মন সেই বিচ্যুতিকে অবাক হয়ে বোঝার, মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছে। এখানে লেখিকা ভীষণ নিপুণতার সাথে দেখিয়েছেন যে, নারীর প্রতি সামাজিক প্রত্যাশা কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রকাশ নয় বরং এটি সমাজের শিকড়গত, মজ্জাগত বিষয়, এখানে জয়তী যে লড়াই টা করছে, তা যতখানি প্রকাশ্যে হচ্ছে, তার থেকে বেশি তার ধারণায় এর ছাপকে সে বারং বার পুনরঞ্জীবিত করছে।

কারণ জয়তী মনে করে অরুণ তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। জয়তীর শাশুড়ি অরুণের মা গ্রামের বাড়ি ছেড়ে ছেলের সাথে শহরে তিন তলা ফ্ল্যাটে থাকতে চান না তাতেও অরুণ জয়তীকেই দোষারোপ করে। যদিও অরুণ নিজে এত শহুরে সুবিধায় থাকে কিন্তু মাকে গ্রামে রেখে দিয়েছে তবে এ বিষয়ে অরুণের কোন স্বীকারোক্তি নেই। এখানে জয়তীর আশ্রয় চেষ্টা যে, সে পরিবারে তথা সমাজের বিধি বিধান পালনে বন্ধপরিষ্কার হবে। লেখিকা জয়তী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নারীর কি কি করণীয়, পালনীয় তার যেমন দেখাচ্ছেন অপরদিকে মেয়েদের করণীয় না করলে সে যে কতখানি লাঞ্চিত এবং অবাস্তব বলে প্রতীত হয় তা স্পষ্ট করেছেন।

“একদিনের একভূমিতে’ গল্পে সীতা ও গীতা বছর আঠাশ ও ত্রিশের দুই বোন পিতা পরেশ সরকার মা শেফালী সরকার এবং ছোট ভাই গোপাল এর ছোট পরিবার। দুই বোন সীতা আর গীতা বিপরীত প্রকৃতির মানুষ তদ্ সত্ত্বেও তাদের একটি কামরায় থাকতে হয়। সীতার ঘুমের আগে বেশ খানিক ক্ষণ গোয়েন্দা গল্পের বই না পড়লে চলে না, আর দিদি গীতা রাতে খেয়ে এসেই ঘর অন্ধকার করে না ফেললে চলে না। সীতা সারারাত ফুল দমে ফ্যান চালায় অপরদিকে গীতার এত হাওয়া সহ্য হয় না। ছোটখাটো অনেক ব্যাপারে তাদের দুয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। সীতা যেখানে সব কিছু বাকিদের দিয়ে মানিয়ে নেয় সেখানে গীতার শান্ত স্বভাব বিনা চেষ্টায় তার কথা মেনে নেয়। স্বভাবে কৃপন পরেশ সরকার গৃহিণী শেফালীর অনিবার্য প্রয়াসে দুই মেয়েকে অতি সুরক্ষিত ভাবে ঘরে বন্দি করে তবে ঘুমাতে যায়। তাই একরাতে সীতা যখন এক মর্মান্তিক আত্ননাদ শুনতে পেল, সে বারে বারে শব্দটি চেনার চেষ্টা করছে, বারে বারে সে মেলানোর চেষ্টা করছে, তাদের মাকে সে এমন আত্ননাদ করতে শুনেছিলো কোন একদিন যখন কোন এক নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর খবর এসেছিল। দুই বোন একটি ছিটকানি আটকান ঘরে থাকে, এখানে গীতার ধারণা - মা যেন তাদের মায়ের নিজস্ব এলাকার বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়ে যায়।

...তেতো গলায় বলে, আচ্ছা সীতা এই খাবার- ঘরটায় এত কী হীরে - মুক্তো আছে রে, তাই মা সামলায়?”<sup>১৯</sup>

এর উত্তরে সীতা গীতার ধারণাস্পষ্টকরণ করে বলল, হীরে মুক্তো অন্য কিছু নয় বরং তারা দুই জন এবং মা তাদের মুঠোর মধ্যে রাখার জন্য ঘরের ছিটকানি বন্ধ করে দেয়। -

“আশ্চর্য! আমরা কি রাতে পালিয়ে যাব নাকি?”<sup>২০</sup>

লেখিকা শেফালীর চরিত্রকে সমসাময়িক রক্ষণশীল সমাজে মেয়েদেরকে সুরক্ষিত করতে মরিয়া। সে ছেলে গোপালের ঘরে ছিটকানি তুলে দেওয়ার প্রয়োজন একটি বারের জন্য বোধ করছে না কিন্তু মেয়েরা যাতে তার নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থাকে তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সে করছে।

দুই বোন রাতের অন্ধকারে কোন মহিলার আত্ননাদের শব্দ পেয়েছে, তাতে তারা ভীষণ ভাবে আকাজক্ষা প্রকাশ করছে যে যেন, এই অজানা কিন্তু ঘটমান ঘটনা তাদের বাড়ীতেই হোক। সীতা অপরিচিত দৃশ্য কল্পনা করতে থাকে, হয়তো এক খানা ঘরের তফাতে একটা মৃত পুরুষদেহের কাছে একটি অচৈতন্য নারীদেহ পড়ে আছে। সীতা ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে প্রথম যে কথাগুলো গীতার বর্ণনায় শুনছে তাতে তার মনে হচ্ছে রাতের ঘটনা তাদের বাড়ীতেই হয়েছে। একটু সময় লাগছে মেনে নিতে যে এই ঘটনা তাদের বাড়ি নয় বরং পাশের ফ্ল্যাটের তিন তলায় আগারওয়ালাদের বাড়ীতে মিসেস আগারওয়ালাকে ছুরি মেরে, ডাকাতি করেছে।

তবে কাজের মেয়ে বাসন্তির বর্ণনা অনুযায়ী -

“অ - মা! মেয়েটাকে মুক বেদে গাড়িতে তুলে নে'চলে গ্যালো না? সেই যে ডব্কা মেয়েটা পাজামা পাঞ্জাবী পরে কলেজ যেত আসত গাড়িতে চেপে।”<sup>২১</sup>

গতরাতের এই ঘটনা সমাজে মেয়েদের সুরক্ষার কতখানি প্রয়োজন তা যেমন শেফালীর ঘরে ছিটকানি দেওয়া কে শক্তি যোগায়, কিন্তু দুই বোনের ধারণা তারা যেভাবে জীবনযাপন করছে, তাদের একঘেয়েমি জীবনে একটু দোলাচাল ঘটত।

তাদের পরাধীনতার জীবনে তারা স্বাধীনতার স্বাদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এখানে তাদের স্বার্থপর, বিদ্রোহী করে তুলছে। কিন্তু এসব ই তারা প্রচ্ছন্ন ভাবে আগলে রাখছে।

“গোটা ঘটনা শোনার পর- ‘সীতা একবার দিদির মুখের দিকে তাকাল।

এখন আর দিদির মুখের সেই উত্তেজিত আরক্ত ভাবটা নেই। ফিকে মেরে গেছে। সীতা একটু তিক্ত ব্যঞ্জনাময় হতাশহাসি হেসে বলল, হু। তখনি বুঝেছিলাম! এই আলুভাতে মার্কা ভাগ্যে আবার এসব হত্র জাচ্ছে! ... রাবিশ! কেন? ঘটনাটি পরেশচন্দ্র সরকারের ঘরের দেওয়ালের অপারে না হয়ে, এপারে হতে পারত না?”<sup>২২</sup>

সীতার সাথে গীতা ও এই প্রথম ছোট বোনের কাছে আত্ম সমর্পণ করল এবং একসাথে নিরাশা হতাশায় বসে রইল।

‘আসল বেনারসি ল্যাংড়া’ গল্পে সীমার চরিত্র, তার দম্পতি এবং মাতৃহের ভূমিকা, সবদিক বজায় গল্পে জয়তীর সুগৃহীণী হবার ব্যর্থতা যে সে শাশুড়িকে সাথে রাখতে না পারা আর এমন একটা বিশেষ সময় এ মেয়েকে মানাতে না পারা, ‘একদিন একভূমিতে’ গল্পে শেফালী র মেয়েদের সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা তাদের চরিত্রের পারিবারিক এবং সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার বর্ণনা করছে। তবে এই যে নারীর জীবনের ছকের গঠন, এর থেকে উত্তরণের সম্ভাবনার দিক নির্দেশ করেছেন লেখিকা। যে ভাবে ‘আসল বেনারসী ল্যাংড়া’ গল্পে খুকু লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করা, বা ‘সবদিক বজায়’ গল্পে খুকুর নিজেকে একা ম্যানেজ করে একা বাড়ীতে থাকার ইচ্ছা, একদিন একভূমিতে’ গল্পে জীবনে ধরা বাঁধা গতানুগতিক জীবনের বাইরে শুধুমাত্র রোমাঞ্চকর অনুভূতির লালসায় মর্মান্তিক ঘটনাকে মেনে নেওয়ার ইচ্ছা এই সবই, লেখিকা সুচারু ভাবে পাঠকের কাছে ঠেলে দিয়েছেন, ভাবনায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, এবং নারীর প্রেমাসক্তি, তার দৃঢ় চেতা হয়ে সিদ্ধান্তও নেওয়া বা একটু অন্য রকম জীবনের আকাঙ্ক্ষার পথ দেখাচ্ছেন। মেয়েদের চরিত্রে যতখানি অসহায়তা ফুটিয়ে তুলেছেন, ততই মেয়েদের চরিত্রে এর থেকে বা এর মধ্যে বেপরোয়া হবার সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন। এই উত্তরণ যেন আবার এক নতুন প্রপ্লের জন্ম দিচ্ছে। মেয়ের চরিত্র মেয়ের চরিত্রকে সমাজের কাঠগড়ার এনে দাড়া করাতে কুণ্ঠা বোধ করছে না।

‘ছেলেটা আর লোকটা’ গল্পে নারীর চরিত্র দু-ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এক সম্ভানের মা হিসেবে, যার সম্পূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে মায়া, মমতা, আর সম্ভানের সামনে মাথানত করে নেওয়ার এক সাবলীল ভঙ্গিমা। তবে ক্ষনিকের হলেও ছেলের বিপরীতে যাবার অসফল প্রচেষ্টা। অন্যদিকে রয়েছে সেই ছেলেটির লোকে পরিণত হবার যাত্রায় তার স্ত্রীর ভূমিকা। স্ত্রী হিসেবে যে নারী তার জীবনে পদার্পণ করেছে, সে কোনভাবেই স্বামীর কোন কথাতেই সহমত প্রকাশ করছে না। ছেলেটি যে নারী অর্থাৎ তার মাকে দেখে বড় হয়েছে আর এখন তার জীবনে যে নারী স্ত্রী হিসেবে উপস্থিত তা এক অমিলের বাস্তবায়ন। নারীকে সমাজ যে ভাবে চায় তা হল সে হবে ত্যাগের প্রতীক, নির্বিচারে সবটা স্বীকার করে নেবে, যেমনটা ছেলেটি তার মাকে দেখেছিল। মেয়ের শরীরে শক্তিতে না কুলোলেও ছেলের নাইট স্কুলের বাচ্চাদের খিচুরি করে খাওয়ানোর ব্যাপারটাও মা মেনে নিয়েছে। ঠিকই চলছিল সব হঠাৎ একদিন চিরবিশ্বস্ত মা ছেলেটার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে করে চলে গেল, সেই মুহূর্তে সে আর ছেলে থাকল না লোকে পরিণত হয়ে গেল। সে যে এতদিন একটি খোঁড়া ছেলেটিকে অর্থাৎ ন্যাড়াকে মেয়ের কাজের সাহায্য করার জন্য এনে রেখেছিল, এখন জানতে পারল যে ন্যাড়া চা বানাতেও সক্ষম নয়। অবশেষে পাড়াটুতো মাসি পিসির দৌলতে একখানা স্ত্রী তার জীবনে আসল। সেই সাথে সে লক্ষ্য করল যে তার স্ত্রী তার মেয়ের মতো ত্যাগের প্রতীক নয়, বরং নিজের ষোলোআনা বুঝে নেওয়ার মতো স্বাধীনচেতা মহিলা। এবং ন্যাড়াকে যে শুধু শুধু পুষবে না, তা সে দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করলে না। এদিকে গৃহস্থের সমস্ত নিয়ম কানুন যে আলগা হয়ে যাচ্ছে তা সে লক্ষ্য করলেও তার কিছু করার থাকছে না। এমনকি বৃষ্টির দিনে দুটো বন্ধুকে বাড়ি নিয়ে এসে বৌকে বললে আদা দিয়ে চা আর পাঁপড় ভাজতে, তাতে বৌ জানালো, বাড়ীতে আদা এবং গ্যাস দুটোই শেষ, ফলে বড় জোর চা হতে পারে, তবে দেবী হবে। এ শুনে - ‘উঠে পড়ল।

লোকটা করুণ মুখে বলল, সত্যিই চলে যাবি? কিন্তু বৌ বোধহয় স্টোভ জ্বালছে।

ওরা হেসে উঠল না। ওরাও মুখ করুণ করে বলল, না রে আজ রাত হয়ে গেছে। ঠিক আছে, পাওনা রইল, আর একদিন হবে। গ্যাস এলে খবর দিস।<sup>২৩</sup>

লোকটা - যে এ রাজার রাজত্বে মস্ত বড় পরাজয় এর সমতুল্য। সে ভবতে থাকে নারীর এই বৈশিষ্ট্য তার কাছে অপরিচিত। নারী বলে তার যে ধারণা তার সাথে তার স্ত্রীর কোন মিল সে খুঁজে পাচ্ছে না। আবার তার স্ত্রীর চরিত্রে তার সামাজিক বেড়া জালের থেকে বেরিয়ে নিজের ইচ্ছেমত জীবন যাপন করা যেটা সেই ছেলেটি এত দিন ধরে করে আসছিল তার সাথে অসম্ভব মিল লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিকতার বাহক যে শুধুই পুরুষ তাই নয়, নারীও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকাতা বয়ে বেরায় লেখিকা ভীষণ ভালোভাবে তার উপস্থাপন করেছেন।

লেখিকা তার 'যুদ্ধ' গল্পে সন্তানহীনা নারীর জীবনের অলঙ্করণ করছেন, মালতির মামাতো ভাই সমীর সবেমাত্র বিয়ে করে নতুন বউ সুরঙ্গমার অনারে পিকনিক করছে তাতেই নেমন্তন্ন করতে এসেছে দিদি মালতি এবং জামাইবাবু সুধাকরকে।

“আমাদের আনন্দে যোগ দিয়ে আমাদের বাধিত কর’।

অবশ্য মালতিদি সম্পর্কে সমীরের মনোভাব দায়সারা নয়, বরং রীতিমত উচ্চ।”<sup>৪৪</sup>

সমীরের কাছে মালতিদি একাই একহাজার। যেমন অনুষ্ঠান জমাতে পারে, তেমন করিৎকর্মা। পিকনিকের রান্নাটা মালতিদির কাছে কোন ব্যাপার না। সন্তানহীনা কোন পিছুটান নেই এমন মহিলাকে সুবিধের খাতায় রেখেছে সমীর। অন্যদিকে সন্তানহীনা দম্পতি যুগল, এ -

“জামাইবাবু দাবায় ওস্তাদ, তাসে পটু আডডায় একনঘর, তার ওপর হাত দেখতে জানে, ম্যাজিক দেখতে পারে। এসব গুণ মজলিশের পক্ষে আদর্শগুণ।”<sup>৪৫</sup>

‘পিকনিকের কথায় মালতির বুক ধড়ফড় করে উঠল, -

‘মালতি মুখ-চোখ করুণ করে হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলে, ‘করবে না? ওই বুড়ো মস্তানকে একঝাঁক সুন্দরী সুন্দরী তরুণীর মাঝখানে ছেড়ে দিলাম, ভাবলে বুক স্থির থাকতে পারে?’<sup>৪৬</sup>

সুধাকর পাশের ঘর থেকে এই ধরনের মন্তব্যে মালতিকে ছাবলা বলে সম্বোধন করছে। তবে তাদের এই কৌতুকাভিনয় নতুন দম্পতিদের বেশ ভালো লাগছে, প্রতীত হচ্ছে মালতি এবং সুধাকর ছেলে-মেয়ে না হওয়াটাকে উপভোগ করছে। তাদের একে অপরকে শব্দবাণের নিক্ষেপ সমীর ও সুরঙ্গমার কাছে অধরা থেকে যাচ্ছে। সুধাকর যে কখন তার অবচেতনে নিজেকে মজার ছলে নরপিশাচ পাষাণের নামে অভিহিত করছে তাও তাদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। মালতি চেনে তার স্বামীকে যে নাকি ভাগবত পাঠের নাম শুনে -

“মালতি হাল-ছাড়া গলায় বলে, ‘আহা ছুটির দিনে একা বাড়ীতে বসে ভাগবত পাঠ করবে! এমন দিন ও হবে? হে মা কালী, তোমায় হরির লুঠ দেব, লোকটার যেন সত্যি সেই সুমতি হয়।’”<sup>৪৭</sup>

সুরঙ্গমার মালতিদি ও জামাইবাবুর জীবন দর্শন ভালো লাগে। যে এরা হেঁসে খেলে কাটিয়ে দিচ্ছে। এবং তার এক খুড়ি র সাথে তুলনা ও করে, যার ছেলে-মেয়ে না হওয়ায়, সমাজে নিজেকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করে।

“...এই তো এক খুড়ি আছেন, ছেলে-মেয়ে হয় নি, তিনি রাতদিন পেঁচামুখ করে ঘুরে বেড়ান, যেখান থেকে পারেন, আর যত পারেন মাদুলি এনে পরেন, আর যত পারেন ডাজর দেখান। দেখলে রাগ।। ...ছেলে-মেয়ে কী এমন নিধিরে বাবা! কী সুন্দর এঁদের এই জীবন! হাসি- আহ্লাদ মজা! এই নিয়েই আছেন!”<sup>৪৮</sup>

‘সুরঙ্গমা সদ্য দাম্পত্য জীবনে পা রেখেছে। কাজেই সমাজে সন্তানহীনতা হবার যে সুপ্ত প্রতিক্রিয়া যেমন সমীরের কাছে মালতি আর তার স্বামী সময় বিলাসীতার উপায়ে পরিণত হয়েছে, তা তাদের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে যাচ্ছে, অপরদিকে - ‘সেই দিকে ক্ষুরক্ষুদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখে ভাবে সুধাকর, মেয়েগুলো কি চতুর! ... আর হাসলে অদের যা দেখায় না! ...’<sup>৪৯</sup> এই উক্তি গোটা গল্প জুড়ে মালতির তার স্বামীর চরিত্রের প্রতি দিকনির্দেশকে প্রমাণ করে দেয়। শেষে মালতি শান্ত গলায় স্বামীকে উত্তর করা, যে ‘ওটা ঠাট্টা, এটা প্রমাণ করা তো তোমারই হাতে।’ এ ধরনের উক্তি প্রমাণ রাখে, সমীর এবং তার স্ত্রীর ভাবনার অনেক দূরে মালতি ও সুধাকর এর জীবন। লেখিকা এখানে দেখিয়েছেন যে সন্তানহীনা নারীকে সমাজে পুরুষের চাইতে অনেক বেশি নিজেকে নারী এবং মা হিসেবে প্রমাণ করার দায়ভার নিতে হয়।

নারীর জীবনে ডিভোর্সের পর বা দম্পতির দাম্পত্য জীবনের অকাল পরিণতির সাক্ষ্য বহন করে ‘চালাঘর’ নামক অণুগল্প। সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মালবিকা তার বান্ধবী কাজরীর থেকে খবর পেল চৈতালি আর সুদীপ্ত ডিভোর্স হয়ে গেল। এই ডিভোর্সের খবর তা মালবিকার কাছে যেন প্রিয়জনের মরণখবরের সমান। কাজেই সে কাজরীকে প্রস্তাব দেয়, একবার গিয়ে দেখা করা উচিত। তাদের কথোপকথনে চৈতালির অসহায়তার বর্ণনা উঠে আসছে বারেবারে-

“তো চৈতালি ওর বাপের বাড়িই চলে গেছে তাহলে? ... তা সত্যি। আর কোথায় যাবে! ডিভোর্সের এইটাই ট্রাজিডি! ছেলেদের সব ঠায় ঠিক বজায় থাকে, মেয়েগুলোই উদ্বাস্ত হয়ে যায়!... ঠিক না? এই, কী হল? হ্যালো! হ্যালো! কাজরী! বাঃ! কেটে গেল।”<sup>২০</sup>

চা খেতে খেতে মালবিকা চৈতালির সংসারের কাণ্ড কারখানার স্মৃতি চারণ করতে লাগলো। বিয়ের পাঁচ ছটা বছর কাটিয়েছে, তারুণ্য বজায় রাখতে সন্তান নেয়নি, তাদের হঠাৎ বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা যেন বিনা মেঘে বজ্রঘাত। এখন এ বিষয়ে মালবিকা তার যত বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু বান্ধবী ছিল সবার কাছে ফোন করে করে শেষে গৌতমের কাছে জানতে পারে সুদীপ্তর মা মারা গেছেন, তবে মা সুদীপ্তর বড় দাদার কাছে থাকতেন। এসব তা জেনে মালবিকার হিংসা মিশ্রিত চিন্তায় বারবার চৈতালির ভাবনা হচ্ছে। চৈতালির আহ্লাদিপনা ঘুচে যাবার, তার বাবার অবস্থা ভালো না হওয়ায়, চৈতালিকে কাজ খুঁজতে হবে সেটাও মালবিকা অবলীলায় ভাবছে।

“হয়েছিল কী সুদীপ্তর মা মারা যাওয়ায় চৈতালি শুধু বলেছিল হবিষ্যি ফবিস্যি যা খুশি কর বাপু মাথাটা যেন ন্যাড়া করে বোস না।”<sup>২১</sup>

যা মালবিকার কাছে কোন ভাবেই অন্যায় কথা নয় কিন্তু তার স্বামী অরুণের কাছে খুব ‘ন্যায়’ কথা বলে মনে হচ্ছিল না এবং এই বিষয়ে অরুণ ও যে সুদীপ্তর দিকে তা বোঝার অসুবিধে নাই, অরুণ হেঁসে বললে, খড়ের চালের বাসিন্দা যদি হাতের জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা ভুল জায়গায় ছুঁড়ে বসে তাতে চালাঘরে আগুন লাগা স্বাভাবিক।

ছোটগল্প হল এক পশলা বৃষ্টির মত, যখন তখন সাহিত্য রসাস্বাদনের এক সহজ উপায়। তবে এর ভূমিকা মানুষের জীবনের অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের মন মস্তিষ্কে অনায়াসে ছাপ ফেলতে পারে। সামাজিক জীবন এর একটা স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে, সে এর থেকে জীবনী শিক্ষা অর্জন করে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যস্ততার মধ্যে ও এটা নিয়ে ভাবার সুযোগ থাকে অনেক বেশি। এক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবীর অগ্রস্থিত অণুগল্পে নারী চরিত্রে নারীর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের বিল্লসেসনে দেখা গেছে নারীকে নারী হতে হলে তাকে সমাজের চাহিদাগুলি পূরণ করতে হবে। এই সমাজে তার ভূমিকার চালিকা শক্তি হিসেবে রয়েছে বিশেষ কিছু অনিবার্যতা। যা লিঙ্গবৈষম্যকে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়, তাই পুরুষ রা এর যতখানি অংশীদার নারীরা ও ততখানি অংশীদার। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সাহিত্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। লেখিকা এখানে সমাজে নারীর জীবনের প্রমাণ দর্শন, নারীর জীবন গঠনের অনুষণে যে শুধুমাত্র নারীর নয় বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যৌথ প্রয়াসে লিঙ্গ রাজনীতি মুক্ত হবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার দিক নির্দেশন করেছেন। মূলত সমাজের পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা প্রসূত নারীর সম্পর্কিত প্রাধান্যকারি বয়ানের আঙ্গিকে দেখান হয়েছে, কিভাবে এর থেকে উত্তরণের একক প্রয়াস মানুষকে মানবিকতার প্রশ্নে বিচলিত করে তুলতে পারে, কিভাবে মানুষ নিজের তৈরি বঞ্চনায় সে নিজেও পরতে পারে। তাই সমাজের যে বিশেষ অনুষণে দীর্ঘদিন একশ্রেণী প্রশ্ন তুলেছে, তার উত্তর খোঁজার দায়িত্ব লিঙ্গ ভেদে সমস্ত মানব জাতির, সেখানে লিঙ্গ ভেদে, জাতভেদে, শ্রেণী ভেদে মানুষ মানুষকে বর্গে না রেখে সমান ভাবে বাঁচার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। লিঙ্গ বৈষম্য মুক্ত পরিবার তথা সমাজে মানুষ হিসেবে নারীর জীবনের প্রত্যেক পর্যায় সে সম্মানের সাথে নিজের অবদান রাখতে সফল হবে।

## Reference:

১. দেবী, আশাপূর্ণা, ‘রচনাবলী’ দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৬৭৬
২. ঐ, পৃ. ৬৭৬
৩. ঐ, পৃ. ৬৭৬

৪. ঐ, পৃ. ৬৭৮
৫. ঐ, পৃ. ৬৮০
৬. দেবী, আশাপূর্ণা, 'রচনাবলী' তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৬৬৩
৭. ঐ, পৃ. ৬৬৪
৮. ঐ, পৃ. ৬৬৩
৯. ঐ, পৃ. ৬৪৮
১০. ঐ, পৃ. ৬৪৮
১১. ঐ, পৃ. ৬৫২
১২. ঐ, পৃ. ৬৫২
১৩. ঐ, পৃ. ৬৬২
১৪. ঐ, পৃ. ৬৮১
১৫. ঐ, পৃ. ৬৮১
১৬. ঐ, পৃ. ৬৮২
১৭. ঐ, পৃ. ৬৮৬
১৮. ঐ, পৃ. ৬৮৬
১৯. ঐ, পৃ. ৬৮৬
২০. ঐ, পৃ. ৬৭১
২১. ঐ, পৃ. ৬৭৫